তাকফিরের ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ি; কারণ ও প্রতিকার

মূল : মুফতি উবাইদুর রহমান

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন বশির

বিষয়বস্তুর পরিচয় ও গুরুত্ব

ইসলাম ও কুফর যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হলো এই দুইয়ের মাঝে সীমারেখাগুলো সকলের কাছে স্পষ্ট রাখা। একজন মুসলমানকে 'কাফের' সাব্যস্ত করা যেমন অনেক ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয় তেমনি একজন কাফেরকে 'মুসলমান' বলাও অসংখ্য ফিতনা ও ক্ষতির কারণ। আলোচিত প্রবন্ধে এই সংক্রান্ত প্রচলিত কিছু অতি ছাড়াছাড়ি চিহ্নিত করে দলিলের আলোকে সেগুলোর প্রতিকার ও বেঁচে থাকার কারণসমূহ উল্লেখ করা হবে।

মূল দাবী

শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করা যেমন হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ, তেমনি কাফেরকে মুসলমান বলাও সমপর্যায়ের হারাম ও ঘৃণিত একটি কাজ। সকল মুসলমানের, বিশেষত আলেমদের দায়িত্ব হলো দীনের অন্যান্য বিধিবিধান ও বিষয়াদির মত এই সংক্রান্ত বিষয়েও পূর্ণ সতর্কতা ও আমনতদারিতার সাথে পদক্ষেপ নিবে। মুসলমানকে কাফের বলা বা কাফেরকে মুসলমান বলা—দুটোর কোনোটিই তারা করবে না। সালাফদের যুগে এটাই ছিলো স্বীকৃত কর্মপন্থা।

এর অন্যতম বড় কারণ হলো,

১. ইসলাম ও কুফর এবং মুসলমান ও কাফের; এদুয়ের মাঝে পার্থক্য রেখা স্পষ্ট রাখা জরুরতে দীনের অন্তর্ভুক্ত।

২. কোনো মুসলমানকে 'কাফের সাব্যস্ত করা' এটি সম্পূর্ণ একটি দীনি বিধান। আর দীনের বিধানে একজন আলেমের অবস্থান হলো 'আমানতদার'। যে দীনের যেকোনো বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের আলোকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য। শরীয়তের নির্দেশনার বাহিরে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ নিলে সে 'খেয়ানতকারী' ও 'প্রতারক' বলে সাব্যস্ত হবে।

৩. ইসলাম এবং কুফরের মাঝে অসংখ্য বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। এখন কোনো কাফেরকে মুসলমান বললে দীনের সে অসংখ্য মাসআলার মাঝে ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। বিপরীত সূরতেও একই কথা—মুসলমানকে কাফের বললেও অসংখ্য বিধানের মাঝে ত্রুটি ও সংমিশ্রণ হয়ে যাবে।

একজন মুসলমান যখন কাফের হয়ে যায় তখন তার উপর শরয়ী বিভিন্ন বিধান আরোপিত হয়। যার মাঝে কতকের সম্পর্ক 'হুকুকুল্লাহ' (আল্লাহর হক) এর সাথে। আর কিছু বিষয়ের সম্পর্ক হলো 'হুকুকুল ইবাদ'-এর সাথে। ফকিহ আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রহিমাহুল্লাহসহ অসংখ্য মুহাক্কিক ফকিহ এই মত গ্রহণ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি থেকে যদি সর্বসম্মত কোনো কুফর প্রকাশ হয়ে যায়, আর তাতে শরয়ী তাবিলের সম্ভবনা থাকে তাহলে তাবিলের সম্ভবনা থাকার কারণে তাকে স্পষ্ট কাফের বলা হবে না। তবে তা সত্ত্বেও তার উপর ঐ সকল বিষয়ে কুফরের বিধিবিধান জারি হয়ে যাওয়া উচিত, যে বিধানগুলোর সম্পর্ক 'হুকুকল ইবাদ'-এর সাথে। ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে যে,

(قوله لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن) ظاهره أنه لا يفتى به من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته. وقد يقال: المراد الأول فقط، لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم بأن يكون قصد ذلك التأويل، وهذا لا ينافي معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ما صرحوا به من أنهم إذا أراد أن يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بلا قصد لا يصدقه القاضي وإن كان لا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالى، فتأمل ذلك وحرره نقلا فإني لم أر التصريح به، نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح وظاهره أنه أمر احتياط. (، كتاب الجهاد، باب المرتد)

অর্থাৎ, স্পষ্ট কুফর ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পেলেও যদি তাবিলের কোনো সম্ভবনা থাকে তাহলে তাকে কাফের বলা হবে না। এর অর্থ তাকে হত্যা করা হবে না। তবে স্ত্রী তালাক হয়ে যাওয়াসহ হুকুকুল ইবাদের সাথে সম্পৃক্ত বিধান তার উপর প্রযোজ্য হবে। তাই বিবাহ নবায়ন করা, দিল থেকে তাওবা করার ব্যপারে তাকে আদেশ দেয়া হবে। আর এটাই হলো সতর্কতা।[1]

কিন্তু দুঃখজনক হলো আমাদের সময়ে 'তাকফির'-এর ক্ষেত্রে শুধু বাড়াবাড়ির নিন্দা করা হয়। মাসআলার অপরদিক তথা তাকফিরের ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ির ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। ফলে 'তাকফির'-এর শরয়ী দায়িত্ব পালনে ছাড়াছাড়ির অভ্যাস শুধু বেড়েই চলছে। যার আবশ্যকীয় নতিজা এই দাঁড়িয়েছে যে, ঐ সকল ব্যক্তি বা জামাতকেও আমরা তাকফির করা থেকে বিরত থাকছি যাদেরকে তাকফির করা শরয়ী মূলনীতির আলোকে শুধু জায়েযই নয় ক্ষেত্র বিশেষ আবশ্যকও হয়ে যায়।

[1]. ফাতাওয়ায়ে শামী ৪/২২৯

তেমনিভাবে এমন অসংখ্য কুফরি কথা ও কাজের মাঝে আমরা অনর্থক তাবিল বের করছি যেগুলো একদম স্পষ্ট হওয়ার ফলে তাতে তাবিলের কোনো সুযোগই নেই। অথচ মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের নিকট স্পষ্ট কুফরি কথা ও কাজে তাবিলের সুযোগ তো নেই বরং যার থেকে তা প্রকাশ পাবে সে নিজেও যদি বলে আমার এই কথা ও কাজ দ্বারা আমার কুফরি নয় ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে তাও গ্রহণযোগ্য নয়। মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১০১৪ হি.) 'শরহুশ শিফা' নামক গ্রন্থে লেখেন,

(وقال) أي ابن أبي سليمان (في رجل قيل له) أي ردا لما قاله (لا وحق رسول الله؛ فقال فعل الله برسول الله كذا وكذا وذكر كلاما قبيحا) أي لا ينبغي أن يذكر صريحا (فقيل له) إنكارا عليه (ما تقول يا عدو الله في حق رسول الله فقال أشد) أي كلاما أقبح (من كلامه الأول ثم قال إنما أردت برسول الله العقرب) **فإنه أرسل من عند الحق وسلط على الخلق تأويلا للرسالة العرفية بالإرادة اللغوية وهو مردود عند القواعد الشرعية... (لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح) لا يقبل)** أي ادعاؤه (لأنه امتهان) أي احتقار له صلى الله تعالى عليه وسلم (وهو) (غير معزر) ... (لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا موقر له) أي ولا معظم لشأنه حيث غير وصفه الخاص به وأراد به حيوانا استحق مهانة (فوجب إباحة دمه) لتقصيره في توقيره. (شرح الشفاء ٣٩٦/٢، القسم الرابع، الباب الأول: في بيان ما هو في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص، ط. دار الكتب العلمية)

অর্থাৎ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কেউ যদি স্পষ্টে শব্দে কোনো আপত্তিকর কথা বলে, এরপর সে বলে আমি তো আপত্তিকর কোনো উদ্দেশ্য নেইনি। বরং আমার উদ্দেশ্য ছিলো ভালো। তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা স্পষ্ট শব্দে তাবিলের দাবী অগ্রহণযোগ্য।[2]

[2]. শরহুশ শিফা ২/৩৯৬

তাকফিরের অধ্যায়ে ছাড়াছাড়ির পাঁচটি কারণ ও তার প্রতিকার :

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাকফিরের ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পিছনে কয়েকটি মৌলিক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হলো।

প্রথম কারণ : তাকফিরের ক্ষেত্রে অসতর্কতা হলে তার নিন্দাকেই যথেষ্ট মনে করা এবং মাসআলার অপরদিকে একদমই দৃষ্টি না দেওয়া।

এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো ব্যক্তি বা জামাতকে তাকফিরের ক্ষেত্রে অসতর্কতা অনেক নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ একটি কাজ। এবং এই অসতর্কতার ফলে নিন্দা করা দোষনীয়ও নয় এবং ক্ষতিকরও নয়। ক্ষতিকর হলো, শুধু তাকফিরের নিন্দা ও নিষিদ্ধতার বিষয়ে এত বাড়াবাড়ি করা যে, মাসআলার অপরদিকটি বলা থেকে টালবাহানা করা ও বিরত থাকা। এবং এর প্রতি কোনোরকম ভ্রুক্ষেপ না করা। দুঃখজনক হলো প্রায়োগিক জীবনে এটাই দেখা গিয়েছে যে, তাকফিরের নিন্দা ও অতি পর্যায়ের সতর্কতা তো খুব করা হয়, কিন্তু তাকফির না করার ক্ষতিসমূহের প্রতি উল্লেখ করার মত দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না।

প্রতিকার :

আলেমদের জিম্মাদারী হলো একটি মাসআলার অনেকগুলো দিক যখন থাকে তখন শুধু মাসআলার একটি দিকের উপর বেশি জোর না দেওয়া। বরং সকল দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে হুকুম বর্ণনা করা এবং সকল দিকগুলোই উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়া। হাঁ, কখনো বিশেষ প্রয়োজনে মাসআলার একটি দিকের প্রতি বেশি জোর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব

হলে তা করা যেতে পারে। বরং তখন সে বিষয়টিতে জোর দেওয়াই শরীয়তের তাকাজা হয়। তবে সময়ে সময়ে মাসআলার অন্যান্য দিকগুলোও বলতে থাকতে হবে যাতে উম্মতের অন্তরে মাসআলার একটি দিকই দৃঢ় হয়ে বসে না যায়। কেননা কোনো মাসআলার যদি একটি যদি উম্মতের অন্তরে বিশেষভাবে বসে যায় আর অন্যদিকগুলোর ব্যাপারে উদাসীনতা তৈরি হয়ে তা একদম হারিয়ে যায় তাহলে এতে অসংখ্য ক্ষতি ও ফিতনার জন্ম নেয়। যা ফতোয়ার কাজ করা মুফতিয়ানে কেরামের কাছে অজানা নয়।

দ্বিতীয় কারণ : প্রপাগাণ্ডার তীব্রতা

কাদিয়ানীদের কাফের ঘোষণার সময় তাদের ও তাদের সহচরদের থেকে এই বিষয়ে প্রচুর প্রপাগাণ্ডা চালানো হয় যে, 'হুজুরদের কাজই হলো শুধু কথায় কথায় মানুষকে কাফের বলা'। মিডিয়াসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তারা এই কথার খুব প্রচার-প্রসার করেছে এবং লোকদের অন্তরে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, 'হুজুররা কাউকে কাফের বললে তা এত গুরুত্বের সাথে দেখার কিছু নেই। কারণ এদের কাজই হলো শুধু অন্যকে কাফের বানানো।' এই প্রপাগাণ্ডার ফলে অসংখ্য ব্যক্তি ও ঘরোনাকে দেখা যায় তারা সতর্কতার নামে তাকফিরের ক্ষেত্রে বেশ ছাড়াছাড়ি করে এবং এই ভয়ে থাকে যে, আমিও যদি কাউকে কাফের বলি, তাহলে আমাকে নিয়েও প্রপাগাণ্ডা শুরু হয়ে যাবে।

প্রতিকার :

এর প্রতিকার হলো নিজেদের লোক হোক বা অন্যরা; কারো প্রপাগাণ্ডা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাবে না। আহলে ইলমের জিম্মাদারী হলো শরীয়তের যে মহান ও পবিত্র ইমারত রয়েছে তাকে পাহাড়া দিয়ে যাওয়া। আর

পাহাড়ার যা যা দাবী তা পূর্ণভাবে করতে থাকা। কে প্রশংসা করবে বা কে নিন্দা করবে—এসবের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ একদম না করা। কেননা এগুলো থেকেই অসংখ্য সমস্যার জন্ম হয়।

আর ইখলাসের দাবীও হলো মানুষের সমালোচনা ও পর্যালোচনার প্রতি লক্ষ্য না করে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শরয়ী দাবীর আলোকে কাজ করে যাওয়া। মানুষ কী বলবে এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া 'ইখলাসের'-এর সাথে সাংঘর্ষিক। কাফেরকে কাফের মনে করা এবং সঠিক সময়ে তা বলা আহলে ইলমের একটি ফরজ দায়িত্ব। তাতে কোনোরূপ ত্রুটি বা অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। যে বিষয় থেকে পূর্ণ বেঁচে থাকা উচিত তা হলো মানুষকে 'কাফের বানানো'। অর্থাৎ, এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশ তৈরি করা যার ফলে মানুষ কুফরের রাস্তা গ্রহণ করে নেয়। অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা অনর্থক কারণে কোনো মুসলমানকে কাফের বলে দেওয়া।

তৃতীয় কারণ : মুসলমানদের আধিক্য কামণা করা

বহুলোক এই আশঙ্কায় পতিত হয় যে, তাকফির করলে তো মুসলিম পরিচয়ধারী বহু ব্যক্তিকে কাফের বলতে হবে। আর এভাবে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের মাঝে প্রভাব তৈরি হবে। তাই শুধু শুধু মুসলমানদের সংখ্যা কমিয়ে কী লাভ! বরং আমাদের জন্য মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ানোর ফিকির করা দরকার ।

প্রতিকার :

এই ধরনের চিন্তা ইসলামী জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত। যার কারণে এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনারও প্রয়োজন নেই। এই ভুল চিন্তার মূল উৎস হলো, অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামকেও আদমশুমারিতে আধিক্যের সাথে

দেখানোর একটি ইচ্ছা। অথচ আদমশুমারির আধিক্যতা ইসলামের ভিত্তি নয়। বরং নির্দিষ্ট কিছু চিন্তা ও আকিদা-বিশ্বাসের উপরই ইসলামের ইমারত প্রতিষ্ঠিত। যদি সেগুলোতে ভাঙ্গন তৈরি হয় তাহলে ইসলাম শেষ হয়ে যাবে, চাই পুরো দুনিয়ার মানুষ ইসলামের অনুসারী দাবী করুক না কেনো। নির্দিষ্ট সে মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধু আদমশুমারিতে ইসলামের আধিক্য দেখতে চাওয়া ইসলামের শিক্ষার ব্যাপারে চূড়ান্ত মূর্খতার আলমত বৈ কিছুই নয়। এই চাহিদা দীনের কল্যাণকামীতার রাস্তা নয়। বরং দীনের মাঝে মতানৈক্য ও বিবেদ তৈরির এক শক্তিশালী মাধ্যম।

চতুর্থ কারণ : নিজেকে মধ্যমপন্থী প্রমানের মানসিকতা

বিভিন্ন সময় তাকফির না করাকে 'মধ্যমপন্থা' হিসেবে গণ্য করা হয়। যার ফলে শরয়ী কারণ পাওয়া যাওয়ার পরেও তাকফিরের ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকে। এবং তাকফির করাকে মধ্যমপন্থার সাথে সাংঘর্ষিক মনে করা হয়।

প্রতিকার :

ইতিদাল বা মধ্যপন্থা মূলত একটি আপেক্ষিক বিষয়। প্রত্যেক বাড়াবাড়ি তার চেয়ে বড় বাড়াবাড়ির তুলনায় মধ্যমপন্থা বলেই মনে হয়। তেমনিভাবে প্রত্যেক ছাড়াছাড়িকে তার ছেয়ে বেশি ছাড়াছাড়ির তুলনায় মধ্যমপন্থা গণ্য করা হয়। এজন্য কোনো বিষয়কে মধ্যমপন্থা নির্ধারনের একমাত্র ভিত্তি হলো শরয়ী দলিল। সুতরাং নিজের কোনো অবস্থানকে মধ্যমপন্থা হিসেবে প্রমাণ করার নিরাপদ ও উপযোগি মাধ্যম হলো তা শরয়ী দলিলের আলোকে প্রমাণ করা। বিশেষ সংশোধনযোগ্য বর্তমান সময়ের একটি অন্যতম পদভ্রষ্টতা হলো, কোনো একটি মাসআলায় যদি দুটো মত হয়ে

যায়, তাহলে দুমতের মাঝে একটি মাঝখানের মত অবলম্বন করাকেই মধ্যমপন্থা হিসেবে স্বীকৃত দিয়ে দেওয়া হয়!

আহলে ইলমের বৈশিষ্ট্য তো হলো এসকল পাতলা বিষয়গুলো কখনোই তাদের ইলমি গভীরতা ও দীনের বিষয়ে সুক্ষদৃষ্টিতে কোনোরকম প্রভাব ফেলতে পারবে না। অন্যথায় শব্দ ও পরিভাষার দ্বারা ধোঁকা খাওয়ার সাথে সাথে দীনের সীমারেখা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। বিশেষত ফিতনার এই কঠিন যামানায় যেখানে বিভিন্ন শব্দ ও পরিভাষাকে ধোঁকায় আবৃত করে পেশ করা হয়।

পঞ্চম কারণ : বিভিন্ন ভুল বিষয়কে তাকফিরের জন্য শর্ত বানানো

কিছু বিষয়কে তাকফিরের ভিত্তি বানানোর কারনেও তাকফিরের মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়। উদাহরণসরূপ, কেউ যদি কোনো অকাট্ট বিষয় অস্বীকার করে তাহলে এমন ব্যক্তিকে তাকফির করার জন্য 'শতভাগ নিশ্চিত হওয়া'কে জরুরি মনে করা। অর্থাৎ, যে বিষয়ের কারণে ব্যক্তিকে কাফের বলা হচ্ছে, সে বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত কুফরি হওয়া যেমন জরুরি মনে করা হয়, তেমনি ব্যক্তি থেকে অকাট্ট কুফরি প্রকাশ হওয়ার বিষয়টিও মুফতি সাহেবের কাছে শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে পৌঁছাকে তাকফিরের জন্য জরুরি মনে করা।

প্রতিকার :

অথচ বাস্তবতা হলো, এই চিন্তা সঠিক নয়। বরং এটি একটি ভুল ধারণা। এবং তা খুবই ব্যাপক। তাই এর প্রতিকার সংক্রান্ত আলোচনা আমরা শেষে স্বতন্ত্র একটি শিরোনামে উল্লেখ করবো।

তাকফির ও তাদলিলে সালাফদের অনুকরণীয় কর্মপন্থা :

আমাদের সালাফে সালিহিন তাকফির ও তাদলিল বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা ও উন্নত চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। আজকাল যেগুলোকে 'উদারতা' ও বিভিন্ন চমকদার শব্দের মোড়কে প্রসিদ্ধ করা হয়েছে, তা তাদের সময়ে ছিলো না। কুফরের বিষয়ে তাঁরা ছিলেন দৃঢ়চেতা ও কঠোর। এই বিষয়ে কোনোরকম ছাড় তারা পছন্দ করতেন না। হযরত ওমর ফারুক রা.সহ অসংখ্য সাহাবাদের ঘটনাগুলো তাদের উত্তম কর্মপন্থার সাক্ষী হয়ে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আমাদের জন্য পথপদর্শক হয়ে আছে। মনসুর হাল্লাজসহ অসংখ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে সালাফদের কর্মপন্থা তাদের সেই দৃঢ়চেতনা মনোভাবকে স্পষ্ট করে দেয়।

হযত সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি রহিমাহুল্লাহ লেখেন,

'নবীগণ ছিলেন কুফরের মূলোৎপাটনকারী। তারা কুফরের সাথে কোনোরূপ উদারতার পরিচয় দিতেন না। তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও তাঁদের ছিলো এক বিশেষ যোগ্যতা। কুফরের সুক্ষ সুক্ষ বিষয়গুলো তাঁরা ধরে ফেলতে পারতেন। এবং আল্লাহ তাআলাও তাঁদেরক এই বিষয়ে দৃঢ়তা ও কর্মকৌশল দান করেছিলেন। নবীগণ সে যোগ্যতা মাধ্যমে ঈমান ও কুফরের যে সীমানা বেঁধে দিয়ে গেছেন, যে পার্থক্যকরণের চিহ্নিত ও পরিচিতগুলো তাঁরা স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন সেগুলো রক্ষা করা ছাড়া দীনের রক্ষা করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। তাই সেগুলো রক্ষা করা আবশ্যক। এতে সামান্য ঢিলামি বা উদারতা পদর্শন করা হলে আল্লাহ পদত্ত ইসলাম ঠিক তেমনই বিকৃত হয়ে যাবে যেমনটা ইহুদি, খ্রিস্টান ও হিন্দুরা তাদের ধর্মগুলো হয়ে গিয়েছে।'

এরপর আলী মিয়া নদবি আরো লেখেন,

‘নবীগণের সঠিক উত্তরসূরীদেরও এই বিষয়ে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি ও দৃঢ়চেতা মনোভাব। তাঁরা কুফরের একেকটি নিশানা মিটিয়ে দেন এবং জাহিলিয়াতের প্রতিটি ময়লা ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে ফেলেন। কুফরি বিষয়গুলো বুঝার ক্ষেত্রেও তাঁদের থাকে বিশেষ যোগ্যতা। কুফর যে পরিচয় আর অবয়বেই প্রকাশ হোক না কেনো তাঁরা সেগুলো বুঝে ফেলতেন এবং নিজেদের সর্বোচ্চ উজার করে সেগুলোর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নামতেন। ভারতবর্ষের মত স্থানে যখন বিধবা নারীদের দ্বিতীয় বিবাহকে নিষিদ্ধ ও ঘৃণার চোখে দেখা হতে লাগলো আলেমরা এর মাঝে কুফরের গন্ধ অনুভব করলেন এবং বিধবা নারী বিবাহকে সমাজে প্রচলন করতে ও সুন্নতকে পূনরজ্জীবিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন এবং একাজে নিজের জীবনকে কুরবান করে দিতেও তাঁরা পিছপা হতেন না। আবার কোথাও শরীয়তের বিধিবিধানের উপর রেওয়াজ ও প্রচলনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে বোনদের পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে বাড়াবাড়ি করাকে তাঁদের কাছে কুফর মনে হতে থাকে এবং এসকল লোকদের বিরোধিতা ও এদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে তাঁরা ফরজ মনে করে। কোথাও আবার আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের স্পষ্ট বিধান শুনার পরেও তা না মেনে অনিসলামি আদালত ও অনিসলামি আইনের শরণাপন্ন হওয়া এবং অনিসলামি আইনকে প্রতিষ্ঠিত করাকে তাঁদের কাছে ইসলাম ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার সমর্থক মনে হয়। এবং এমন পরিবেশে অপরাগ হয়ে তারা হিজরত করে অন্যথায় চলে যেতেন। নও মুসলিম বা অমুসলিম এলাকায় বসবাসকারী মুসলমান যদি এমন কোনো প্রাণী খাওয়া থেকে বিরত থাকে বা অপছন্দ করে, তার প্রতিবেশী ও স্বদেশী অমুসলিমরা যাকে ব্যাপকভাবে অপছন্দ করে, (যেমন

গরু) তাহলে এটা সেই মুসলমানের ঈমানের দুর্বলতা এবং পূর্ব ধর্ম কিংবা অমুসলিমদের সাহচর্যের প্রভাব বলে মনে হয়।'[3]

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরামের বিশেষ বৈশিষ্ট :

এই বিষয়ে উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরামের এক বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে। উম্মতের মধ্যে যখনই কোনো গোমারহি বা কুফরি ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তখন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মেলিত ফতোয়া ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে দেয়। যার অসংখ্য ফায়েদা রয়েছে।

১। ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে দীনি সচেতনতা তৈরি হয়।

২। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আলেমদের মাঝে দীনের স্বার্থে ঐক্য তৈরি হয়।

৩। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তের মাঝে একটি শক্তি তৈরি হয়। যার ফলে সংশ্লিষ্ট ফিতনাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

'তাকফির' ও 'তাদলিল'-এর ঐক্যবদ্ধ ফতোয়ার কয়েকটি উদাহরণ :

১। কাদিয়ানীদের থেকে যখন বিভিন্ন কুফরি প্রকাশ পেতে থাকলো এবং হাজারো লোক তাদের কুফরের জালে আটকে পড়ে ঈমান হারাতে লাগলো তখন আলেমরা সম্মেলিতভাবে কাদিয়ানিরা কাফের এই ফতোয়া প্রকাশ করলেন।

[3] দীনে হক আউর ওলামায়ে রব্বানী পৃ. ৮২, ৯২

২। গোলাম আহমেদ পারভেজ ও অন্যরা যখন হাদিস অস্বীকারের আওয়াজ উঠালো তখন তখন তখন আলেমের প্রচেষ্টায় আলেগণ সম্মেলিত ফতোয়া প্রকাশ করেন। যা উম্মতকে এই ফিতনা থেকে রক্ষায় বিশেষ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। সম্মেলিত সে ফতোয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মুফতিয়ে আজম ওলি হাসান খাঁন টুঙ্কি রহিমাহুল্লাহের রচিত 'ফিতনায়ে ইনকারে হাদিস' দ্রষ্টব্য।

৩। ইরানী বিপ্লব পরবর্তী সময়ে যখন রাফেজিয়াত ও শিয়াবাদের ফিতনায় নতুন জোশ আসলো তখন সাহসী কিছু আলেম এগিয়ে আসলেন রাফেজিয়াতের বিরুদ্ধে সম্মেলিত ফতোয়া তৈরি করলেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাওলানা মনজুর নোমানীর রহিমাহুল্লাহ রচিত 'ইরানী ইনকেলাব'। এবং জামিয়াতুল ইসলামিয়া বানুরী টাউন থেকে প্রকাশিত 'মাহনামায়ে বাইয়িনাত'-এর এই সংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যা।

৪। পাকিস্তানে যখন 'আগাখানি'দের ফিতনা বিভিন্ন এলাকাকে আক্রান্ত করলো তখন সেখানের স্থানীয় আলেমগণ সম্মেলিতভাবে ফতোয়া দিলেন আগাখানিরা কাফের। শহিদ মাওলানা উবাইদুল্লাহ ছাতরালবি ও অন্যান্য আলেমদের যৌথ রচনা 'আগাখানিয়্যাত' ওলামায়ে উম্মত ক্যে নজর ম্যে' দেখা যেতে পারে।

৫। জাভেদ আহমদ গামেদি লেখালেখতে শুরু থেকেই গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতার বীজ রয়েছে, তা ওলামায়ে কেরাম ধরতে পারছিলেন। পরে যখন তা একদম সুস্পষ্ট হয়ে গেলো এবং মানুষরাও সে গোমরাহির দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকলো তখন পাকিস্তানের সাহসি কিছু যুবক আলেম পূর্ণ সাহসিকতা ও হিম্মতের সাথে আলেমদের থেকে সম্মেলিত ফতোয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। ফলশ্রুতিতে অসংখ্য আলেমের লিখিত ও মৌকিখ ফতোয়া জমা হয়ে গেলো। যাতে এটা স্পষ্ট ছিলো, জাভেদ আহমদ গামেদি

একজন গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। এই ফতোয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে দেখুন, 'মাজাল্লায়ে সফদার'-এর বিশেষ সংখ্যা 'ফিতনায়ে গামেদি'।

তাকফিরের জন্য সুনিশ্চিত হওয়া; একটি পর্যালোচনা :

কতক ব্যক্তি ও ঘরোনার তাকফির বিষয়ে ছাড়াছাড়ির আরেকটি মৌলিক কারণ হলো তারা তাকফির সঠিক হওয়ার জন্য এই বিষয়টিকে জরুরি মনে করে যে, কোনো জামাত বা ব্যক্তিকে কাফের বলার জন্য জরুরি হলো, যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে উক্ত ব্যাক্তি বা জামাতকে কাফের বলা হচ্ছে তা ব্যক্তি বা দল থেকে অকাট্ট ও সুনিশ্চিতভাবে প্রকাশিত হওয়ার প্রমাণিত হতে হবে। যদি মুফতির কাছে উক্ত বিষয়টি সুনিশ্চিত ও অকাট্ট খবরের সাথে না পৌঁছে তাহলে তার জন্য তাকফির করার কোনো সুযোগ নেই। এজন্য তারা তাকফির বিষয়ে উদারতা ও সহজতার পরিচয় দেয়। যদিও শরয়ী উসুলের দাবী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও জামাতকে তাকফির করার সুযোগ থাকে।

এই চিন্তা সঠিক নয়। তাকফিরের বিষয়ে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। শরয়ী যেকোনো বিধানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়োর প্রবনতা অপছন্দনীয় কাজ। আর তাকফিরের ক্ষেত্রে তো তা আরো বিশেষ করে সতর্কতা কাম্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাকফিরের ক্ষেত্রে এমন অনর্থক সব শর্ত আরোপ করা, যার মাধ্যমে তাকফিরের দরজাই বন্ধ হয়ে যায়!

মূলনীতি হলো, দীনের অন্যান্য বিধানের মত তাকফিরও একটি 'মুআমালা'। যার সাথে আরো অসংখ্য বিধানের সম্পৃক্ততা রয়েছে। সুতরাং দীনের অন্যান্য বিধানের প্রয়োগের জন্য যেমন 'সুনিশ্চিত জ্ঞান' আবশ্যক নয়। বরং প্রবল ধারনার ভিত্তিতেও প্রয়োগ করা সঠিক। তেমনি

তাকফিরের বিষয়েও সুনিশ্চিয়তা ও অকাট্টতা জরুরি নয়। বরং প্রবল ধারণার ভিত্তিতেও তাকফির করা সঠিক। সুতরাং যদি শরীয়তের আলোকে সুনিশ্চিত কুফরি এমন কোনো বিষয় যদি কোনো ব্যক্তি বা জামাত করে, তবে সে নিশ্চিত কুফরিটি উক্ত ব্যক্তি বা জামাত করেছে কি না তা সুনিশ্চিতভাবে নাও জানা যায় বরং প্রবল ধারণার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের তাকফির করতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম গাজালী রহিমাহুল্লাহের তাহকিক :

ইমাম গাজালী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৫০৫ হি.) এই বিষয়ে লেখেন,

ولا ينبغي أن يظن أن التكفير و نفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدم، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ شائر الأحكام الشرعية، فتارة يدرك بيقين، وتارة بظن غالب، وتارة يتردد فيه، مهما حصل فالتوقف فيه عن التكفير أولى. (فيصلة التفرقة بين الإسلام و الزندقة ص ٦٠)

‘এ কথা মনে করা অনুচিত যে, কাউকে তাকফির করা ও না করার বিষয়টি সর্বস্থানে অকাট্ট দলিল থেকেই হতে হবে। বরং তাকফির করা একটি শরয়ী বিধান। যার সঙ্গে কারো জানমাল বৈধ হওয়া, না হওয়া, কাউকে হত্যা করা, না করা এবং কারো ব্যাপারে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া না হওয়ার মত বিষয়গুলো সম্পৃক্ত। তাই দীনের অন্যান্য বিধান সাব্যস্ত হওয়ার যে উৎস, এখানেও তেমনটাই হবে—কখনো তা অকাট্টভাবে প্রমাণিত হবে। আবার কখনো প্রবল ধারণার ভিত্তিতে প্রমাণিত হবে।

আবার কখনো সংশয়ের ভিত্তিতে প্রমাণিত হবে। সুতরাং যেখানে সন্দেহের ভিত্তিতে হবে সেখানে তাকফির না করাই উত্তম।'[4]

এথেকে স্পষ্ট যে, তাকফিরের ক্ষেত্রে বিরত থাকতে হবে ঐ সূরতে, যেখানে ব্যক্তি থেকে কুফর প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি 'সন্দেহ'-এর সাথে প্রমাণিত হয়েছে। তবে যেখানে প্রবল ধারণা অথবা সুনিশ্চতভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেখানে তাকফির থেকে বিরত থাকা কাম্য নয়।

ইমাম গাজালী রহিমাহুল্লাহ তাঁর অপর আরেক কিতাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে লেখেন,

اعلم أن للفرق في هذا مبالغات وتعصبات، فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعزى إليها، فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولاً وتعاطى فعلاً، فإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد. (الاقتصاد في الاعتقاد ١٣٢، الباب الرابع: بيان من يجب تكفيره من الفرق)

অর্থাৎ, কোনো কুফরি কথা ও কাজের কারণে কাউকে কাফের বলা এটি একটি ফিকহি বিষয়। সুতরাং, ফিকহি বিধান যেমন অকাট্ট দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তেমনি ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেও প্রমাণিত হয়।[5]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহিমাহুল্লাহের তাহকিক :

[4]. ফাইসালাতুত তাফরিকা পৃ. ৬০

[5]. আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ পৃ. ১৩২

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১৩৫৩ হি.) এই সংক্রান্ত সালাফদের বেশকিছু মুহাক্কিক আলেমদের মতামত উল্লেখ করার পর লেখেন,

يريدون أن الحديث إذا كان خبر واحد يصلح مأخذاً ومبني لمسألة التكفير في حق المفتي، وأما الرجل المكفر اسم مفعول، فإنما يكفر في نفسه بإنكار القطعي لا بإنكار الظني، وذلك في حقه، وأما المفتي فيكفي في حقه ظنه بأن فلاناً أنكر قطعياً، ولا يجب له القطع، ونظيره أن خبر الواحد يعمل به في مسائل الرجم، ولا يثبت في الحكم إلا بشهادة أربعة ذكور، فهكذا ههنا، والحاصل أن الموجب لكفر الرجل في نفسه هو إنكار قطعي، وأما الموجه والمنبه للمفتي في مسألة تكفيره قد سكون حديثاً آحادياً فينبهه على أن إنكار أمر كذا كفر، ثم لا يكون ذلك الأمر في الواقع إلا قطعياً. (إكفار الملحدين ص ٦٧، تنبيه من الراقم)

অর্থাৎ, ইসলামে অকাট্টভাবে প্রমাণিত এমন কোনো বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফের বলা হবে। তবে অকাট্ট নয় এমন বিষয় অস্বীকার করলে ব্যক্তি কাফের হবে না। আর এটা কর্মসম্পাদনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু মুফতি সাহেবের জন্য কাউকে কাফের ফতোয়া দেওয়ার জন্য খবর ওয়াহেদের মাধ্যমে এই বিষয়টি পৌঁছাই যথেষ্ঠ যে, অমুক ব্যক্তি ইসলামের কোনো অকাট্ট বিধান অস্বীকার করেছে। তাকফিরের ফতোয়া দেওয়ার জন্য মুফতি সাহেবের কাছে ব্যক্তির অস্বীকারের বিষয়টি অকাট্ট দলিলের আলোকে পোঁছা আবশ্যক নয়।[6]

উক্ত কিতাবের অপর এক স্থানে লেখেন,

[6]. ইকফারুল মুলহিদিন পৃ. ৬৭

مأخذ التكفير أي دليله الذي أخذ منه وبنى عليه، قد يكون ظنياً ونظيره العمل بالظن في حالة الجهاد إذا تردد في شخص أهو مسلم أم لا؟ ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعاً في كل مقام. بل التكفير حكم شرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدم، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارةً يدرك بيقين وتارة يظن غالب وتارةً يتردد فيه، ومهما حصل تردد فالوقف فيه عن التكفير أولى. "فيصل التفرقة". (إكفار الملحدين ص ١١٦، مأخذ التكفير)

যেসন দলিলের ভিত্তিতে কাউকে কাফির বলা হবে, তা অকাট্ট হওয়া আবশ্যক নয়। বরং দলিলে যন্নীও যথেষ্ট। এর উদাহরণ হলো, যুদ্ধের ময়দানে কারো ব্যাপারে এই সন্দেহ হয় লোকটি মুসলমান না কাফের, তাহলে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। 'ফাইসালাতুত তাফরিকা' গ্রন্থে রয়েছে, 'এ কথা মনে করা অনুচিত যে, কাউকে তাকফির করা ও না করার বিষয়টি সর্বস্থানে অকাট্ট দলিল থেকেই হতে হবে। বরং তাকফির করা একটি শরয়ী বিধান। যার সঙ্গে কারো জানমাল বৈধ হওয়া না হওয়া, কাউকে হত্যা করা না করা এবং কারো ব্যাপারে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া না হওয়ার মত বিষয়গুলো সম্পৃক্ত। তাই দীনের অন্যান্য বিধান সাব্যস্ত হওয়ার যে উৎস, এখানেও তেমনটাই হব—কখনো তা অকাট্টভাবে প্রমাণিত হবে। আবার কখনো প্রবল ধারণার ভিত্তিতে প্রমাণিত হবে। আবার কখনো সংশয়ের ভিত্তিতে প্রমাণিত হবে। সুতরাং যেখানে সন্দেহের ভিত্তিতে হবে সেখানে তাকফির না করাই উত্তম।' [7]

[7] ইকফারুল মুলহিদিন পৃ. ১১৬
কাশ্মীরী রহিমাহুল্লাহু এই বিষয়টি আরো খোলাসা ও সহজ করে বলেছেন ফাইজুল বারী কিতাবে। তিনি বলেন,

প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ :

১। তাকফিরের বিষয়ে যেমন বাড়াবাড়ি করা, কথায় কথায় কোনো ব্যক্তি বা দলকে কাফের বলা নাজায়েয নিন্দনীয় কাজ। যা থেকে পূর্ণভাবে বিরত থাকা আবশ্যক। তেমনিভাবে তাকফির বিষয়ে ছাড়াছাড়ি করা এবং শরয়ী মূলনীতির আলোকে কাফের সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তি বা দলকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকাও নাজায়েয ও নিন্দনীয় কাজ। উভয় বিষয়ে সতর্ক হওয়াই আমাদের জন্য আবশ্যক।

২। আমাদের মধ্যে যেমন তাকফির বিষয়ে বিভিন্ন সময় বাড়াবাড়ি হয়েছে। এবং তা এখনো হয়। তেমনি তাকফির বিষয়ে ছাড়াছাড়িও অতিত ও বর্তমানে বারবার হয়ে যাচ্ছে।

৩। তাকফির বিষয়ে ছাড়াছাড়ির কয়েকটি কারণ এই প্রবন্ধ চিহ্নিত করা হয়েছে। বিষয়গুলোর প্রতিকার হওয়া কাম্য।

أن الموجب لكفر الرجل في نفسه، هو إنكار قطعي. وأما المنبه للمفتي في تكفيره، فقد يكون حديثا آحاديا، فينبهه على أن إنكار أمر كذا، كفر. ثم لا يكون ذلك الأمر في الواقع إلا قطعيا، ومثاله: أن رجلا عالما عد المتواترات والقطعيات وفهرسها، وذهل وغفل عن بعضها، فلم يدخله في ذلك الفهرس، فجاء واحد آخر ونبه على قطعيات أخر، فأدخله بقول ذلك الواحد في هذا الفهرس، فقد تنبه بقول واحد للقطعي. فهكذا الأمر ههنا لم يكفر الرجل إلا بإنكار قطعي في نفسه، لكن المفتي قد يأخذ مسألة التكفير من خبر واحد، فيجوز بناء التكفير على الظني بلا خطر، لأن الظن في طريق العلم بالحكم، لا في أمر الموجب لكفر المكفر. (فيض الباري ١/١٤٤، كتاب الإيمان، أقسام الكفر.)
(আব্দুল্লাহ)